ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম

মো. রেজুয়ান খান

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ফল উৎপাদনের জন্য এক অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উঁচু পাহাড়, টিলা এবং সমতল জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির ফল জন্মায়। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে এই এলাকার সমতল ও উঁচু স্থানে আম, কাঁঠাল, পেঁপে, কলা এবং আনারসের ফলন হয়। সারাবছর মৌসুমি ফল উৎপাদনে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই অঞ্চলের স্থানীয় বাজারগুলো এখন মৌসুমি ফল বিক্রয়ের জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছে।

সবুজে ঘেরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় এক লাখ হেক্টর জমিতে মৌসুমি ফলের বাগান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে কিছু ফল সারাবছর পাওয়া যায়। যার মধ্যে রসালো আম, মিষ্টি কাঁঠাল আর সুস্বাদু আনারসের প্রাচুর্য চোখে পড়ার মতো। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলের মাটি বিদেশি ফল উৎপাদনেও দারুণ উপযোগী। ম্যাংগোস্টিন, রাম্বুটান, রসকো (স্থানীয় ভাষায় তাইথাক বা রক্তফল নামে পরিচিত), চিন্দিরা, আমড়া, আনোনা, মারফা, লংগান, প্যাশন ফ্রুট এ নামগুলো দেশি ফলগুলোর সাথে মিশে পার্বত্যঞ্চলের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছে। এ ফলগুলো এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক ফলন হচ্ছে এবং স্থানীয় বাজারগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে। বলা যায়, সারা দেশে বছরজুড়ে দেশের বাজারে যে পরিমাণ ফল উৎপাদিত হয়, তার সিংহভাগের যোগান দেয় পার্বত্য অঞ্চল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদিত ফলগুলো পরিবেশবান্ধব ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ও টেকসই কৃষি উদ্যোগ হিসেবে ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এর উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হলেও আর্থিক লাভ বেশ উল্লেখযোগ্য, যা পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য এক নতুন গতি সৃষ্টি করছে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য ফল চাষ শুধু খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যম নয়, বরং আয় ও জীবিকা নির্বাহের একটি নির্ভরযোগ্য উৎসে পরিণত হয়েছে। কৃষিজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ার ফলে নিয়মিত আয় নিশ্চিত হচ্ছে, যা স্থানীয় পরিবারগুলোর জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে। পাহাড়ি অঞ্চলে উৎপাদিত মৌসুমি ফলগুলো শুধু স্বাদে অনন্য নয়, বরং পুষ্টিগুণেও ভরপুর- যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই ফলগুলো পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাসের অংশ হয়ে উঠেছে এবং স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীরা এখন ফল চাষে কেবল সহায়ক শক্তি নন, বরং একটি আত্মনির্ভরশীল, গতিশীল অংশীদারে পরিণত হয়েছেন। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার নানা পাহাড়ি অঞ্চলে নারীরা তাদের নিজেদের উদ্যোগে আম, লিচু, কাঁঠাল, কমলা, আনারস, কলা, পেঁপে ও ড্রাগন ফলসহ নানাবিধ মৌসুমি ফল চাষ করছেন। তারা শুধু ফল উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ফল রক্ষণাবেক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের প্রতিটি ধাপেই সক্রিয়ভাবে জড়িত। স্থানীয় নারী উদ্যোক্তারা জ্যাম, জেলি, আচার, শুকনো ফল প্রক্রিয়াজাত করে স্থানীয় বাজার ছাড়াও শহরের সুপারশপ ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিক্রয় করে তাদের নিজেদের আয় এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় প্রশিক্ষণ নিয়ে নারীরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জৈব সার ব্যবহার এবং সঠিক সংগ্রহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলের মানোন্নয়ন ঘটাচ্ছেন। এভাবে তারা শুধু পরিবার ও সমাজে অবদান রাখছেন না, বরং নারীর ক্ষমতায়ন, স্বনির্ভরতা এবং স্থানীয় অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদিত অর্গানিক ফলসমূহ রাসায়নিকমুক্ত ও প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হওয়ায় অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত এবং মানবদেহের পুষ্টির জন্য উপযোগী। স্থানীয় বাজারে সরবরাহ ছাড়াও শহরাঞ্চল ও আন্তর্জাতিক বাজারে অর্গানিক ফলের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে, যা এই খাতকে রপ্তানিমুখী শিল্পে রূপান্তরের সুযোগ এনে দিয়েছে। এসব ফল বিভিন্ন জটিল রোগ প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পার্বত্য অঞ্চলে ফল চাষের প্রসার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি, পরিবেশবান্ধব চাষ প্রথা ও সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও এটি এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। টেকসই কৃষি কৌশল এবং পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অর্গানিক ফলের ভান্ডার হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

অ্যাগ্রো ইকো ট্যুরিজম এমন একটি পর্যটন মডেল যেখানে কৃষি, পরিবেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে পর্যটন পরিচালিত হয়। এতে বনাঞ্চল সংরক্ষণ, জৈব কৃষি চর্চা এবং স্থানীয় সংস্কৃতির প্রচার হবে-যা টেকসই উন্নয়নের সহায়ক। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ফল বাগান, হস্তশিল্প ও সংস্কৃতিকে পর্যটনের অংশ করে তুলতে পারেন। এতে তারা শুধু আয়ই

করবেন না, বরং নিজেদের ঐতিহ্য ও পরিবেশ রক্ষায়ও ভূমিকা রাখতে পারবেন। পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় ফলের পরিচিতি বাড়লে দেশের বাইরেও এর চাহিদা তৈরি হতে পারে। এতে রপ্তানির সুযোগ বাড়বে এবং কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ফল বাজারজাতকরণে বেশ কিছু কাঠামোগত ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা এই খাতের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে বাধা সৃষ্টি করছে। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, নৌপথের ওপর নির্ভরতা এবং কাপ্তাই হ্রদের পানির স্তর কমে যাওয়ায় অনেক সময় ফল পরিবহণ ব্যাহত হয়। আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ বা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার অভাবে ফল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, ফলে কৃষকরা তাদের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। অনেক কৃষক শহরের বড়ো বাজারে সরাসরি পৌঁছাতে পারেন না, ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন, সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ জোরদার করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাস্তাঘাট উন্নয়ন, পরিবহণের সহজলভ্যতা এবং ফলভিত্তিক শিক্ষা চালু হলে পার্বত্য অঞ্চল হয়ে উঠবে আরও সজীব।

ফলভিত্তিক শিক্ষা (আউটকাম বেজড এডুকেশন) চালু হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে বেশ সহজ হবে। ফলভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ফল চাষ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণনের বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবে, যা সরাসরি কৃষি ও উদ্যোক্তা খাতে কাজে লাগবে। শিক্ষার্থীরা স্থানীয় ফলের বৈচিত্র্য ও পুষ্টিগুণ বুঝে নতুন পণ্য উদ্ভাবনে আগ্রহী হবে- যেমন জ্যাম, জেলি, শুকনো ফল ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা বিপণন কৌশল, ব্র্যান্ডিং ও ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে স্থানীয় ফলকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দিতে পারবে। ফলভিত্তিক শিক্ষা নারীদের ও তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে, বিশেষ করে পাহাড়ি নারীদের জন্য এটি হবে একটি টেকসই বিকল্প। এই শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতা অর্জনে এটি একটি কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ফল উৎপাদন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহারে বাংলাদেশ সরকার গত দুই দশকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, প্রকল্প ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করেছে, যা এই অঞ্চলের কৃষি ও অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে ফল চাষে আগ্রহী কৃষকদের প্রশিক্ষণ, চারা বিতরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার পার্বত্যাঞ্চলে জুমচাষ থেকে সরে এসে স্থায়ী ফল বাগান গড়ে তোলায় উৎসাহ দিচ্ছে। কৃষকদের জন্য মাঠ দিবস, কৃষক সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির পর তিন জেলায় ১২০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৯৮০০টি ব্রিজ ও ১৪০টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে ফল পরিবহণ সহজ হয়েছে এবং কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। উদ্যোক্তারা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সরাসরি ফল বিক্রি করছেন, যা মধ্যস্বত্বভোগীদের নির্ভরতা অনেকটা কমিয়ে এনেছে।

সরকার তিন পার্বত্য জেলায় ফল চাষের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় ৪৫ প্রজাতির ফল উৎপাদিত হচ্ছে, যা দেশে মোট ফল উৎপাদনের প্রায় ১৫ শতাংশ। বান্দরবানেই বছরে ৮ দশমিক ৫ লাখ টন ফল উৎপাদিত হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। প্রায় ১৬ লাখ মানুষের মধ্যে ২৪ শতাংশ মানুষ এখন ফল উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। পাহাড়ি নারীরা ফল চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে নারী ক্ষমতায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। এই সাফল্যগুলো আরও টেকসই করতে হলে প্রয়োজন হবে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, সমন্বিত টোল ব্যবস্থা, সহজ শর্তে ঋণ এবং ফলভিত্তিক শিল্প স্থাপন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রঙিন পাহাড় যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত করে, তেমনি এখানকার মৌসুমি ফলের বৈচিত্র্য ও পুষ্টিমূল্য আমাদের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির জন্য এক অনন্য সম্পদ। এই অঞ্চলের কৃষকেরা, বিশেষ করে নারীরা, ফল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের প্রতিটি ধাপে অংশ নিয়ে নিজেদের শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয়, সামাজিকভাবেও আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলছেন। সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় জনগণের সমন্বিত প্রয়াস এই সম্ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পারে ফলভিত্তিক টেকসই উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক পর্যটনের অনন্য উদাহরণ। তাই প্রয়োজন সংরক্ষণে সহনশীলতা, উৎপাদনে উদ্ভাবন, আর বাজারে সাহসী অংশগ্রহণ।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার